ইসলামী অর্থব্যবস্থায় 'উশর এর ভূমিকা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

অধ্যাপক ড.আ.ক.ম.আবদুল কাদের
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা :

'উশর ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর সম্পর্ক ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের সাথে। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ হওয়ার কারণে এ দেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে 'উশর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫% মুসলিম। অথচ তারা 'উশর এর ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শর'য়ী বিধান সম্পর্কে অবহিত নয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে 'উশর এর পরিচয়, এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রায়োগিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'উশর -এর পরিচয় ঃ

'উশর'(العشر)শব্দটি একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল - এক দশমাংশ (جزء من عشرة أجزاء)।[১] ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়-মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত হিসাবে ভূমির প্রকারভেদে $\frac{1}{10}$ (এক দশমাংশ) অথবা $\frac{1}{20}$ তথা ৫ শতাংশ ফসল শরীয়াহ নির্ধারিত খাতসমূহে আদায় করাকে 'উশর বলা হয়।[২] ফিকহ ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে 'উশরকে 'সাদাকাত' এবং যাকাত হিসাবেও অভিহিত করা হয়েছে। $\frac{1}{10}$ তথা 'উশর এবং $\frac{1}{20}$ তথা অর্ধ 'উশর ফরয হওয়ার বিষয়টি আল-কুরআন, সুন্নাহ এবং আয়িম্মা কিরামের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ফরয ইবাদত।

'উশর ফরয হওয়ার দার্শনিক ভিত্তি ঃ

ভূমি হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র এবং জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস। মহান আল্লাহ ভূমিকে মানুষের বসবাসযোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন এবং একে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। আর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় রিয্ক উৎপাদনের লক্ষ্যে এতে উর্বরাশক্তি দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন [৩]: ولقد مكنكم فىالارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون অর্থাৎ "নি:সন্দেহে আমি তোমাদেরকে এ যমীনে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এখানে তোমাদের জন্য জীবন-জীবিকার সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"

বস্তুত ভূমিতে বীজ বপন হতে শুরু করে ফসল উৎপাদন করা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে অসীম শক্তির আধার মহান আল্লাহর অনুগ্রহের বিশেষ ছোঁয়ার প্রয়োজন পড়ে। পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মাটি সমান উর্বরাশক্তি সম্পন্ন নয় এবং সকল মাটি সমান উৎপাদনশীলও নয়। বীজ লাগানোর পর অংকুরোদগম হওয়া হতে শুরু করে ফসল উৎপাদনক্ষম হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে পানির প্রয়োজন হয়। মহান আল্লাহ অনেক সময় তা আকাশ হতে বর্ষণ করেন। খাল-বিল, নদী-নালা এবং ঝর্ণা থেকেও তার ব্যবস্থা হয়ে থাকে,

আবার মাটির গভীর হতেও পানি আহরণ করা যায়। মহান আল্লাহর কুদরতী ব্যবস্থাপনায় এসব কিছু সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মানুষের কৃতিত্ব নিতান্ত গৌণ।

মহান আল্লাহ বলেন:[৪] افرأيتم ما تحرثون - أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون- لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون- انا لمغرمون- بل نحن محرومون- অর্থাৎ- " তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর না আমি উৎপাদনকারী? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা বানিয়ে দিতে পারি, অত:পর তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যাবে। (বলবে) আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম। বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়লাম"।

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-[৫] وأيه لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنت من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. অর্থাৎ -"আর তাদের জন্য নিদর্শন হল মৃত ভূমি, আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি নির্ঝরিণী, যাতে তারা তার ফল খায় এবং তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অত:পর তারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না " ?

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন -[৬] فلينظر الإ نسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا . فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وحدائق غلبا. وفاكهة وابا . متاعا لكم ولأنعامكم. অর্থাৎ - "মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমরা প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি,অত:পর ভূমিকে উত্তমরূপে বিদীর্ণ করেছি। অত:পর তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি। আর উৎপন্ন করেছি আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তূন, খেজুর, ঘন-সন্নিবেশিত উদ্যান, রকমারী ফল ও ঘাস। তোমাদের জন্য ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জন্য জীবিকার সামগ্রী হিসাবে"।

আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমুহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল- াহর একক ব্যবস্থাপনা ও সুনিপুণ কারুকার্যতায় তাঁরই সৃষ্ট এই ভূমি ফসল ও ফল-ফলাদির সমারোহে প্রাচুর্যময় হয়ে উঠে। তাই ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের 'উশর আদায়ের মাধ্যমেই কেবল তাঁর নিয়ামতের শুকর-গুজারী আদায় হতে পারে। যেহেতু উৎপাদন হল জমির প্রবৃদ্ধির অংশ,আর যে সব সম্পদে প্রবৃদ্ধি সাধিত হয় তাতে যাকাত ফরয,তাই ভূমির উৎপাদিত ফসল এবং ফল-মূলে 'উশর আদায়ের বিধানকে শরীয়াত আবশ্যম্ভাবী কর্তব্যরূপে চিহ্নিত করেছে।[৭]

'উশর ফরয হওয়ার শরয়ী দলীল :

হাদীস এবং ফিকহের গ্রন্থসমূহে 'উশর বিষয়ক আলোচনা যাকাত অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। আল-কুরআনে 'উশর শব্দের উল্লে- খ নেই, তবে এতে ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের 'হক্ক' আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। এ্যাসিরীয় ভাষায় - ISH-RU-U (ইশরুউ) এবং হিব্রু ভাষায় MAASHER (মাআশের) শব্দের উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ হল শাসকবৃন্দ কর্তৃক ফসলের উপর ধার্যকৃত দশমাংশ কর। হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক আনীত শরয়ী বিধানে MAASHER তথা দশমাংশ কর বাধ্যতামূলক প্রবর্তনের উল্লেখ আছে।[৮] খৃষ্টানদের বাইবেলেও USHUR শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯] প্রাচীন আরবের পৌত্তলিকরা ভূমির উৎপন্ন ফসল এবং পশু সম্পদ হতে দেবতার উদ্দেশে নৈবদ্য প্রদানের বিষয়টি আল-কুরআনে আলোচিত হয়েছে। মহান আল- াহ বলেন [১০]- وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا অর্থাৎ " আর এই লোকেরা আল্লাহর জন্য তাঁরই পয়দা করা ক্ষেত-খামারের ফসল এবং গৃহপালিত পশু হতে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে।"

ইসলাম ভূমির উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। একজন ব্যক্তি কি পরিমাণ ভূমির মালিক হবে ইসলাম তার সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়নি সত্য; তবে এই মালিকানা বৈধ পন্থায় হওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। নিজের জমি নিজেকেই চাষাবাদ করতে হবে এমন শর্তও ইসলামে নেই। নিজে চাষাবাদ করলে অথবা অন্যের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে চাষাবাদ করলে কিংবা বার্ষিক কেরায়ার ভিত্তিতে অন্য কাউকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করলে ইসলাম তা অনুমোদন করে। তবে এক্ষেত্রে মালিক এবং কৃষকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয়। আর চাষাবাদের পর উৎপাদিত ফসল নিসাব পরিমাণ হলে তা হতে শরীয়াত নির্ধারিত অংশ সুনির্দিষ্ট খাত সমূহে যাকাত হিসাবে প্রদান করারও ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'উশর বলা হয়।

মহান আল্লাহ সম্পদে বছরে কেবল একবার যাকাত ফরয করেছেন, আর কৃষি ক্ষেত্রে যাকাত তথা 'উশর' ফরয হওয়ার বিষয়টি বছর অতিক্রমণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এর সম্পর্ক ফসল উৎপাদন ও তা আহরণের সাথে [১১]। মালিক কিংবা কৃষকের ভূমির প্রকার, কায়িক শ্রম এবং উৎপাদন ব্যয় অনুসারে উৎপাদিত ফসলের 'উশরের পরিমাণেও তারতম্য হয়ে থাকে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, মহানবী (সা.)-এর হাদীস এবং সাহাবা , তাবিঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণের ইজমার ভিত্তিতে এটি প্রমাণিত যে, স্বাভাবিক উপায়ে উৎপাদিত ফসলে 'উশর তথা $\frac{1}{10}$ অংশ এবং কৃত্রিম উপায়ে তথা সেচ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে অর্ধ 'উশর তথা $\frac{1}{20}$ অংশ আদায় করতে হবে। মহান আল- াহ বলেন [১২] - يا يها الذين امنوا انفقوامن طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض অর্থাৎ - "হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর।" উপরোক্ত আয়াতের ومما اخرجنا لكم من الارض অংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাবারী (রহ.) ভূমি হতে উৎপাদিত ফসল ও ফলের উপর যে সাদাকাত ও যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন [১৩]। আর ফসল ও ফলের যাকাত হচেছ 'উশর।

মহান আল্লাহ বলেন [১৪] - وهوالذى أنشاء جنت معروشت وغير معروشت والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. অর্থাৎ - "তিনিই আল্লাহ যিনি নানা প্রকারের লতা বিশিষ্ট এবং স্বীয় কান্ডের উপর দন্ডায়মান বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগান সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি খেজুর গাছ ও শস্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন যা হতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য লাভ করা যায়। আর যিনি যায়তুন আর আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন, যে গুলোর ফল বাহ্যিকরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু স্বাদে রয়েছে বৈসাদৃশ্য। তোমরা এগুলোর ফল খাও যখন তা ফলন্ত হয়, আর কর্তনের সময় এর 'হক্ক' আদায় কর। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না"।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত - واتوا حقه يوم حصاده (আর কর্তনের সময় তোমরা এর হক আদায় কর)-এর ব্যাখ্যায় হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) এবং হাসান বসরী (রহ.) হতে এর দ্বারা ফরয যাকাতের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে বলে বর্ণিত আছে [১৫]। পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর দ্বারা 'উশর এবং অর্ধ 'উশর প্রদানের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। [১৬]এ আয়াতটি মক্কী যুগে নাযিল হয়েছে এবং প্রাথমিক অবস্থায় এর দ্বারা যাকাত নির্দেশ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু পরবর্তীতে মহানবীর (স.) সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে এর দ্বারা 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর বুঝানো হয়।

'উশর কিংবা অর্ধ উশর ফরয হওয়া বিষয়ে মহানবীর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধান যোগ্য [১৭]- عن عبد الله عمر عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقيا لنضح نصف العشر . অর্থাৎ -" হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত,তিনি তাঁর পিতা উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন , তিনি মহানবী (স.) হতে বর্ণনা করেন। মহানবী (স.) বলেন- যে

সব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদ-নদী দ্বারা স্বভাবিক ভাবে সিঞ্চিত হয় তাতে 'উশর ধার্য্য হবে, আর যে সব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে অর্ধ 'উশর ধার্য্য হবে"।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি ও উল্লেখ করা যেতে পারে - [১৮]

عن جابر بن عبد الله انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشر . অর্থাৎ -"যাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহানবী (স.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন, মহানবী (সা.) বলেন - খাল-নদী ও বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপাদিত হলে তাতে 'উশর ধার্য্য হবে। আর সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয়ে ফসল উৎপাদিত হলে অর্ধ 'উশর ধার্য্য হবে।"

ইয়ামনে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মহানবী (সা.) ইয়ামনবাসীদের নিকট যে পত্র দেন তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, যে সব ভূমিতে প্রবাহিত নহরের পানির সাহায্যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে 'উশর এবং যে ভূমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে অর্ধ 'উশর দিতে হবে।[১৯]

'উশরী ভূমি, 'উশর আদায় পদ্ধতি এবং 'উশর আরোপের ক্ষেত্রে ফসলের প্রকার ভেদ ইত্যাদিতে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে কিছু মতভেদ থাকলেও ভূমির উৎপাদিত ফসলে 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর ফরয হওয়া বিষয়ে তাঁদের মধ্যে 'ইজমা' তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২০]

<u>'উশরী ভূমির পরিচয়</u> :

মহানবীর (স.) যুগে মক্কা, মদীনা, ইয়ামানসহ সমগ্র আরব ভূমি 'উশরী ভুমি হিসাবে পরিগণিত হয়। ইসলামী সম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে 'উশরী ভুমির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। মুসলিমদের নতুন নতুন অঞ্চল বিজয়ের পর বিজিত অঞ্চলের পরিত্যক্ত ভূমি 'উশর প্রদানের শর্তে মুসলমানদেরকে প্রদান করা হয়। শান্তিপূর্ণ সন্ধি সূত্রে যে সব ভূমি মুসলমানদের দখলে আসত তাতে ইতোপূর্বে কোন ভূমিকর ধার্য্য না থাকলে সেগুলো 'উশর আদায়ের শর্তে মুসলমানদের নিকট পত্তন দেয়া হত। যে সব ভূমির উপর কোন কর ধার্য্য ছিল না সে গুলোর মালিক ইসলাম কবুল করলে এবং তাতে তার মালিকানা বহাল থাকলে সে সব 'ভূমি উশরী ভূমি হিসাবে পরিগণিত হত। [২১]পরিত্যক্ত ভূমি যা আবাদ করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বন্টন করা হয়, মৃত ভূমি যা কোন মুসলিম পানি সেঞ্চন করে আবাদ ও সঞ্জীবিত করে, কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিম থেকে ক্রয় কিংবা দান সূত্রে যেই ভূমির মালিকানা অর্জন করে এবং সেই ভূমি যদি কোন স্বাধীন মুসলিম চাষাবাদ করে তবে তাও 'উশরী ভূমি হিসাবে পরিচিত হবে। [২২]

ইমাম আবূ ইউসুফের মতে - যেসব ভূমির মালিক ইসলাম কবুল করেছে, সেই সব ভূমির উপর তাদের মালিকানা পূর্ববৎ বহাল থাকবে এবং তা 'উশরী ভূমি হিসাবে পরিগণিত হবে।[২৩] মুসলিম বিজয়ের পর যদি অধিকৃত অঞ্চলের কোন ভূমি যোদ্ধাদের মাঝে গণীমত হিসাবে বন্টন করা হয় তাও 'উশরী ভূমি হিসাবে পরিগণিত হবে।[২৪] প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা কাসানী 'উশরী ভূমির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- হিজায ও আরবের সমুদয় ভূমি, বিনা যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলের ইসলাম গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মালিকানাধীন ভূমি, যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যামে বিজিত অঞ্চলের সেই সব ভূমি যা রাষ্ট্র প্রধান গণীমতের সম্পদ হিসাবে মুসলিম যোদ্ধাদের নিকট বন্টন করেন এবং পরিত্যক্ত ভূমি যা সরকারের অনুমতিক্রমে মুসলিমগণ চাষাবাদের জন্য আবাদ করে নেয় তা 'উশরী ভূমিরূপে পরিগণিত হবে।[২৫]

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তিন প্রকারের ভূমিকে 'উশরী ভূমি- রূপে চিহ্নিত করেছেন।

১. মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের যে ভূমি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়;
২. এমন ভূমি যার মালিকগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেন এবং ভূমির মালিকানা তাদের নিকট বহাল থাকে, এবং
৩. আরবের সমুদয় ভূমি।[26]

মোট কথা, কোন লোক ইসলাম কবুল করলে তার চাষাবাদযোগ্য ভূমি, আরবের সমুদয় ভূমি, মুজাহিদগণ ও গণীমত প্রাপ্তদের মধ্যে বন্টনকৃত বিজিত অঞ্চলের ভূমি, কোন পরিত্যক্ত ভূমি যা মুসলমানগণ আবাদ করেছেন, সরকারী খাস ভূমি যা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং উত্তরাধিকারীবিহীন যিম্মীর মৃত্যুর পর মুসলমানদের দখলে আসা ভূমি 'উশরী ভূমি হিসাবে পরিগণিত হবে।[27]

কোন কোন ফসলে 'উশর ফরয? :

'উশর মুসলমানদের ভূমিতে উৎপাদিত কৃষি ফসলের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। কিন্তু কোন ধরনের ফসলের 'উশর প্রদান করতে হবে এ বিষয়ে ইসলামী আইনবেত্তা ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । হযরত অবদুল- াহ ইবন 'উমর (রা.) কিছু সংখ্যক তাবি'ঈ এবং পরবর্তী কিছু ফকীহ এ মত পোষণ করেন যে, গম ও যব ব্যতীত অন্য কোন শস্যে এবং খেজুর ,কিসমিস ও মুনাক্কা ব্যতীত অন্য কোন ফলে 'উশর নেই। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসটি উপস্থাপন করেন -[28]
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال انما سن رسول لله صلى الله عليه وسلم الزكاة فى هذه الخمسة فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة .

ইমাম মালিক (রহ.) -এর মতে - যে সব ফসল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং যা সংরক্ষণ উপযোগী তাতে 'উশর ফরয । যথা-ভূট্টা, গম, ধান, ডাল ইত্যাদি । তিনি বলেন -[২৯] السنة عندنا فى الحبوب التى يدخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذمما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلا العشر.

তাঁর মতে - আখরোট, বাদাম, কিসমিস, পেস্ড়া , আপেল, ডালিম, পেয়ারা , যয়তুন, ইত্যাদি সংরক্ষণ উপযোগী হলেও এগুলো সাধারণত: খাদ্য হিসাবে প্রসিদ্ধ নয়। তাই এগুলোতে 'উশর ফরয নয়।[৩০] কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর মতে - যেহেতু হিজাযের অধিবাসীগণ খেজুর ও আঙ্গুরের উপর অধিক নির্ভরশীল তাই এগুলোর উপরও 'উশর ধার্য্য করা হবে।[৩১]

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর মতে - যে সব উৎপাদিত ফসল পরিমাপ করা যায়, সংরক্ষণ করা যায় এবং শুকিয়ে রাখা যায় সেই সব ফসলের 'উশর আদায় করতে হবে । যথা ভুট্টা, গম, খোসাবিহীন যব, ধান, শস্য, তৈলবীজ, সীমবীচি, মসুর, কলাই, বুট, জিরা, ধনিয়া, প্রভৃতি। আর সব ধরনের ফল মূলও শাক-সবজি যেহেত সংরক্ষণ উপযোগী নয়, তাই তাতে কোন 'উশর নেই।[৩২]

ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতে - জমি চাষাবাদের মূল লক্ষ্য হল উৎপাদন। তাই উৎপাদিত ফসলে 'উশর কিংবা অর্ধ উশর প্রদান করতে হবে। এমন কি, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ও অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে বাঁশ, বেত, ঘাস, কাঠ, ইত্যাদি উৎপাদন করা হলে তাতেও 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর প্রদান করতে হবে।[৩৩] তাঁর মতে - উৎপাদিত পণ্য খাদ্য দ্রব্য জাতীয় হওয়া, সংরক্ষণ উপযোগী হওয়া, শুকিয়ে রাখার

উপযোগী হওয়া ও পরিমাপ যোগ্য হওয়া শর্ত নয়। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দলীল সমূহ পেশ করেন।

এক: ومما اخرجنا لكم من الأرض (আর যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি) শীর্ষক আল-কুরআনের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভূমি হতে উৎপাদিত যে কোন ফসলেই 'উশর ফরয।

দুই : আল- কুরআনের وأتوا حقه يوم حصاده (আর কর্তনের সময় তোমরা এর হক্ক আদায় কর) শীর্ষক বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উৎপাদিত ফসল এবং ফল কর্তনের দিনই তার 'উশর অথবা অর্ধ 'উশর আদায় করতে হবে। কোন ধরনের ফসলের 'উশর আদায় করতে হবে তার কোন প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হয়নি।

তিন: মহনবী (স.) এর বাণী - فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر (যে ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদ-নদী দ্বারা স্বভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয় তাতে 'উশর ধার্য্য হবে) দ্বারা প্রামণিত হয় যে, ভূমি হতে উৎপাদিত সব ধরনের ফসলে 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর ফরয।[৩৪]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রসঙ্গিক মনে করি। আর তা হলো, ফসল আহরণের দিন তার 'হক্ক' আদায় করা বিষয়ে মহান আল্লাহ যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা এমন ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা সংরক্ষণ উপযোগী নয়। কারণ, তাতে বিলম্বে 'উশর প্রদান করা হলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ফসলের 'উশর দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দিলে এবং সে গুলো সংরক্ষণ উপযোগী হওয়ার করণে তা নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকার কারণে সেগুলোতে 'উশর বিলম্বে আদায় করা হলেও কোন অসুবিধা নেই। যেমন - ধান, যব, ভুট্টা, ইত্যাদি।

<u>'উশরের নিসাব</u> :

'উশর যেহেতু ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপর ফরয তাই এটি উৎপাদিত ফসল হতেই আদায় করতে হয়। এখন প্রশ্ন হল, কি পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হলে তাতে 'উশর প্রদান করতে হবে? উশরের নিসাব বা পরিমাণ নিয়ে সাহাবা কিরাম এবং আয়িম্মা মুজতাহিদীন - এর মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর ও জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) প্রমূখ সাহাবী, 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয, হাসান বসরী, 'আতা, মাকহুল, ইবরাহীম নাখ'ঈ, প্রমুখ তবি'ঈ এবং ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, সুফিয়ান আল - ছাওরী, আওযা'ঈ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রমুখ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতে - উৎপাদিত ফসলে 'উশরের নিসাব হল পাঁচ ওসক। উৎপাদিত ফসল পাঁচ ওসকের কম হলে তাতে 'উশর ফরয হবে না।[৩৫] এ মতের সমর্থনে তাঁরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ উপস্থাপন করেন -

(ক) عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ليس دون خمسة أوسق صدقة ولادون خمس ذود صدقة ولادون خمسةأواق صدقة . অর্থাৎ-"আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত , মহানবী (সা.) বলেন -ফসল পাঁচ ওসকের কম হলে সাদাকাহ নেই, উট পাঁচটির কম হলে সাদাকাহ নেই,এবং রূপা পাঁচ আওকিয়ার কম হলে সাদাকাহ নেই "।[৩৬]

(খ) عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فى حب ولاتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. অর্থাৎ-হযরত আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন - কোন শস্য কিংবা খেজুর পাঁচ ওসক না হওয়া পর্যন্ড় তাতে সাদাকাহ তথা 'উশর নেই"।[৩৭]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে -'উশরের নির্দিষ্ট কোন নিসাব নেই । উৎপাদিত ফসল কম হোক কিংবা বেশী হোক , তা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়ে উৎপাদিত হলে তাতে 'উশর এবং কৃত্রিম উপায়ে

পানি সেঞ্চনের মাধ্যমে উৎপাদিত হলে তাতে অর্ধ 'উশর প্রদান করতে হবে। প্রমাণ হিসাবে তিনি আল-কুরআনের আয়াত وأتوا حقه يوم حصاده এবং ومما أخرجنا لكم من الارض ও মহানবীর (সা.) হাদীস فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقى با لنضح نصف العشر . প্রভৃতি উপস্থাপন করেন। এতে উশর আদায়ের বিষয়ে বলা হলেও এর কোন নিসাব বর্ণনা করা হয়নি।[৩৮] ইমাম আবূ হানীফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)বলেন - আমরা ইমাম আবূ হানীফার এই মতকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। বরং এ ক্ষেত্রে আমরা তথা ليس دون خمسة اوسق صدقة "পাঁচ ওসকের কম ফসলে কোন সদকাহ নেই" শীর্ষক মহানবীর (সা.) হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করবো।[৩৯]

দেশের প্রায় প্রতিটি নাগরিক কিছু না কিছু শস্য ও ফসল উৎপাদন করে থাকেন। যদি উৎপাদিত ফসলের উপরে ন্যূনতম কোন নিসাব না থাকে তা হলে সকল উৎপাদনকারীকে 'উশর আদায় করতে হবে। ফলে 'উশর গ্রহণকারী পাওয়া দুষ্কর হবে।তা ছাড়া মহানবী (সা.)- تؤخذ من أغنيائهم وتردّ إلى فقرائهم শীর্ষক বাণীর মাধ্যমে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় এবং গরীবদের মধ্যে তা বিলি-বন্টনের যে দর্শন পেশ করেছেন তাও ব্যাহত হবে।[৪০] এতে বুঝা যায় , স্বর্ণ-রৌপ্যের নিসাবের ন্যায় উৎপাদিত ফসলেরও একটা নিসাব থাকা বাঞ্চনীয়,আর তা হল মহানবী (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত পাঁচ ওসক। আল -কুরআনের واتوا حقه يوم حصاده শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়েছে মক্কী যুগে , যাতে ফসল ও ফলের উৎপাদিত অংশের 'হক্ক' তথা যাকাত /সাদাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর ومما اخرجنا لكم من الارض শীর্ষক আয়াতে এবং فيما سقت السماء والعيون اوكان عثريا العشر শীর্ষক হাদীসে ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলে 'উশর প্রদানের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ليس دون خمسة اوسق صدقة শীর্ষক আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'উশরের নিসাব ধার্য্য করা হয়েছে।[৪১] সুতরাং বলা যায়, 'উশরের নিসাব হল পাঁচ ওসক উৎপাদিত শস্য।

এখন প্রশ্ন হল - বাংলাদেশী হিসাবে পাঁচ ওসকের পরিমাণ কত? এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ওসক মূলত: পাত্র দ্বারা পরিমাপের হিসাব। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে যেহেতু পাত্রের পরিমাপ সর্বত্র প্রচলিত নেই, তাই সর্বত্র সমভাবে অনুসরণের সুবিধার্থে আমরা একে ওজনে রূপান্তর করেছি। ইবন কুদামা তাঁর আল-মুগনী গ্রন্থে এবং ইমাম নবভী সহীহ মুসলিম গ্রন্থের 'ওসক' বিষয়ক হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে, প্রতি ওসক = ৬০ সা', আর প্রতি সা'= $5\frac{1}{3}$ ইরাকী রতল।[৪২] বাংলাদেশী হিসাবে প্রতি সা' = ৩.৩১২ গ্রাম,সুতরাং ৫ ওসক তথা ৩০০সা'= ৯৯৩.৬ কেজি যা ২৬ মনের চাইতেও বেশী, স্থানীয় মান হিসাবে প্রতি সা' = ৩ সের ৬ ছটাক । সুতরাং ৩০০ সা'= ১০১৩ সের, যার ওজন ২৬ মনের চাইতে কিছু কম। সব কিছু বিবেচনায় রেখে 'উশরের নিসাব বাংলাদেশী হিসাবে ২৬ মন।

<u>'উশরের বিধান</u> :

'উশর একটি ফরয ইবাদত। যাকাতের ন্যায় 'উশরও সরকারী ব্যবস্থাপনায় আদায় ও বিলি- বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলামী সরকারই নির্ধারণ করবে কোন জমিতে 'উশর এবং কোন জমিতে অর্ধ 'উশর ধার্য্য হবে। কিন্তু যেহেতু বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু নেই তাই ব্যক্তিগত উদ্যেগে যাকাত আদায়ের ন্যায় 'উশর ও আদায় করতে হবে।

ইসলামে ভূমির ধরন, ফসল আহরণে কষ্টের পরিমাণ,আর্থিক বিনিয়োগ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে 'উশরের বিধান আরোপ করা হয়েছে। যদি ভূমি 'উশরী হয় এবং নদী নালা কিংবা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়ে

এতে ফসল উৎপাদিত হয় তবে তাতে 'উশর তথা $\frac{1}{10}$ অংশ প্রদান করতে হবে। আর যদি কূপ খনন করে কিংবা পানি সেঞ্চন করে ফসল উৎপাদন করা হয় তবে তাতে অর্ধ উশর তথা $\frac{1}{20}$ অংশ প্রদান করতে হবে। এ উভয় অবস্থায় 'উশরের হারের তারতম্যের কারণ হল ফসল উৎপাদনে কায়িক পরিশ্রম,অতিরিক্ত মজুরী প্রদান এবং পানি সেঞ্চনে অতিরিক্ত ব্যয় এবং বৃষ্টির পানি কিংবা নদী-নালার পানিতে ফসল উৎপাদনে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি জড়িত না থাকা।[৪৩] গভীর নলকূপ স্থাপন, নালা তৈরী, এবং পানি ক্রয় করে সেচ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় বিধায় এতে অর্ধ 'উশর ধার্য্য হওয়া যুক্তিযুক্ত। তা ছাড়া, যে জমিতে অতিরিক্ত পরিচর্যার পাশাপাশি সার,কীট নাশক ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে তাতেও অর্ধ 'উশর আদায় করা উচিত।[৪৪]

কোন ভূমিতে এক মৌসুমে বৃষ্টির পানি এবং অপর মৌসুমে সেচের পানিতে ফসল উৎপন্ন হলে সে ক্ষেত্রে এক সৌসুমে 'উশর এবং অপর সৌসুমে অর্ধ 'উশর প্রযোজ্য হবে। পানি প্রবাহের জন্য খাল-নর্দমা ইত্যাদি খননের প্রয়োজন হলে একে পতিত ভূমি আবাদ করণের নীতিতে ফেলে এতে 'উশর দিতে হবে । কিন্তু প্রথম বার যদি ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হয় তা হলে প্রথম বার অর্ধ 'উশর এবং পরবর্তীতে 'উশর প্রযোজ্য হবে। কারণ প্রতি মৌসুমে এ ধরনের খাল কিংবা নর্দমা খননের প্রয়োজন পড়েনা।[৪৫] 'উশর কিংধা অর্ধ উশর আদায়ের ক্ষেত্রে সব ধরনের উৎপাদিত ফসলের নিসাব একত্রে ধার্য্য করা যাবেনা। প্রত্যেক প্রকারের ফসলের পৃথক পৃথক হিসাব করে নিসাব ধার্য্য হবে।[৪৬] 'উশর ফরয হবে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদে, কোন সংস্থার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদে নয়।[৪৭]

'উশর, খারাজ ও ভূমিকর কি একই সাথে প্রযোজ্য?:

'উশর, খারাজ ও ভূমিকর একই সাথে প্রযোজ্য কি না এ বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। যদি কোন স্বাধীন মুসলিম খারাজ আদায়ের শর্তে ভূমি চাষাবাদ করে অথবা তাকে খারাজী ভূমি চাষাবাদের জন্য পত্তন দেয়া হয় তা হলে তাকে খারাজ আদায়ের পাশাপাশি উৎপন্ন ফসলের 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর আদায় করতে হবে। ইমাম লাইছ ইবন সাদের মতে খারাজী ভূমিতে 'উশর আরোপ করা হবে না।[৪৮] ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীদের মতে খারাজ ধার্য্য থাকা অবস্থায় 'উশর আদায় করা ফরয নয়। কেবল খারাজী ভূমির উপরই খারাজ ধার্য্য হতে পারে। ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ ও ইকরামা (রহ.) এই মত পোষণ করেন। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মহানবীর (স.) নিম্নোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করেন -[৪৯] لا يجمع العشر والخراج فى أرض مسلم অর্থাৎ- "কোন মুসলিমের ভূমিতে 'উশর ও খারাজ একত্রে ধার্য্য হতে পারে না"।

জমহুর আলিমগণের মতে -'উশর একটি অনিবার্যরূপে আদায়যোগ্য ইবাদত। তাই এটি খারাজ কিংবা ভূমিকর ধার্য্য হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক নয়। খারাজ ও ভূমিকর ধার্য্য হয় ভূমির উপর,চাই তাতে চাষাবাদ হোক বা না হোক, ভূমির মালিক মুসলিম হোক কিংবা অমুলিম হোক। খারাজ ও ভূমিকরের মাধ্যমে ভূমির উপর ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর 'উশর ধার্য্য হয় ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের উপর তথা জমিতে প্রবৃদ্ধি সাধনের উপর। আর এটি ধার্য্য হয় কেবল মুসলিমদের উপর । 'উশর ফরয হয়েছে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আর খারাজ ও ভূমিকর ধার্য করা হয় প্রচলিত আইনের আওতায়।সুতরাং 'উশর এবং খারাজ ও ভূমিকর দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির হক্ক যা ভিন্ন ভিন্ন কারণে ধার্য্য করা হয়।'উশর ব্যয় হয় আল-কুরআন নির্দেশিত ৮টি খাতে, আর খারাজ ও ভূমিকর ব্যয় হয় রাষ্ট্রের

যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা, নিরাপত্তা বিধান,সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন খাতে । সুতরাং 'উশর এবং খরাজ ও ভূমিকর একই সাথে ধার্য্য হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই এবং খারাজ ও ভূমিকর ইত্যাদির কারণে আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত 'উশর রহিত হতে পারে না। যেমন ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দোকান ভাড়া নিয়ে নিয়মিত ভাড়া আদায় করার কারণে দোকানে মজুদ মালামাল ও পুঁজির উপর আরোপিত যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।[৫০] যেমন আয়কর আদায় করার কারণে যাকাত আদায় করা হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না অনুরূপ খারাজ ও ভূমিকর আদায়ের কারণে 'উশরের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।[৫১]

বাংলাদেশের ভূমি কি 'উশরী ভূমি ? :

১২০৩ ঈসায়ী সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন হয়। উক্ত সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত সময়কালকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপভাবে বিভক্ত করা হয়:

ক. ১২০৩ - ১৩৪০ সাল, দিল্লীর মুসলিম বাদশাহগণ কর্তৃক নিযুক্ত সুবেদারদের শাসন;
খ. ১৩৪০ - ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানগণের শাসন;
গ. ১৫৭৬ - ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে শাসন;
ঘ. ১৭৫৭ - ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসন;
ঙ. ১৯৪৭ - ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান আমল;
চ. ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ আমল ।

উপরোক্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১২০৩ সালে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৭৫৭ সালে বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডটি মুসলিম শাসকদের অধীনে ছিল। ১৭৫৭ সালে মুসলিম শাসনের অবসানের পর এখানে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালুর মাধ্যমে এদেশের কৃষকগণ জমি-জমার মালিকানার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। অত:পর ইংরেজদের নিয়োজিত জমিদারদের কাছ থেকে কৃষকগণ রাজস্ব আদায়ের শর্তে জমির বরাদ্দ লাভ করে। ফলে এদেশের আলিম সমাজ ও ফকীহগণ মনে করেন - এদেশের ভূমি 'উশরী নয় । তাঁদের মতে - 'উশর কেবল সেই সব ভূমির উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে গুলো ইসলামী হুকুমত কর্তৃক কৃষকদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়। যে সব ভূমি অমুসলিমদের নিকট হতে ক্রয় করা হয় কিংবা অমুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট হতে রাজস্ব আদায়ের শর্তে বরাদ্দ নেয়া হয় সেই সব ভূমির উৎপাদিত ফসলে 'উশর প্রদান অত্যাবশ্যকীয় নয়।[৫২]

উপরে উল্লেখিত কালপরিক্রমায় আমরা যদি বাংলার ভূমি মালিকানার বিষয়টি পর্যালোচনা করি তা হলে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখতে পাই:

ক. মুসলিম বিজয়ের পর নব দীক্ষিত মুসলিমদের ভূমি, যাতে তাদের পূর্বের মালিকানা বহাল ছিল;
খ. বিজিত অঞ্চলে মুসলিম শাসকবৃন্দ কর্তৃক মুসলিমদের মধ্যে বন্টনকৃত ভূমি;
গ. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি যা বংশানুক্রমিকভাবে মুসলিমদের দখলে ছিল বলে প্রমাণিত;
ঘ. উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা ক্রয়সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি যা কখন-কিভাবে মুসলিমদের দখলে এসেছে তা অজ্ঞাত;
ঙ. ক্রয়, দান কিংবা ওয়াকফসূত্রে প্রাপ্ত ভূমি, যা মুসলিমগণ বংশ পরম্পরায় ভোগ-দখল করে আসছে;
চ. এমন ভূমি, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুসলিমগণ অন্য মুসলিমগণের নিকট থেকে যার মালিকানা

অর্জন করে;

ছ. এমন ভূমি, যা ইংরেজগণ চাষাবাদের জন্য মুসলিমদেরকে পত্তন দিয়েছে কিন্তু পূর্বে এতে কার মালিকানা ছিল তা জানা নেই ;

জ. এমন অনাবাদী ভূমি, যা মুসলিমগণ আবাদ করেছে;

ঝ. এমন পরিত্যক্ত বা খাস ভূমি, যা চাষাবাদের জন্য মুসলিমগণ পত্তন নিয়েছে।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'উশরী ভূমির পরিচয় শীর্ষক আলোচনার আলোকে বাংলাদেশের মুসলিমদের ভূমি মালিকানার দিকগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে,বাংলাদেশের মুসলিমদের মালিকানাধীন অধিকাংশ ভূমিই 'উশরী ভূমি। তাই এ দেশের 'উশরী ভূমিতে উৎপাদিত ফসলে 'উশর কিংবা অর্ধ 'উশর প্রদান করা ফরয।

বাংলাদেশের উৎপাদিত ফসলে 'উশর এর আনুমাণিক হিসাবঃ

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এটি একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পরিচিত হলেও বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী এটি নিম্ন আয়ের দেশসমূহের অন্তর্গত। ১৪ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এদেশের ৫২% লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। কৃষি খাত এদেশের আয়ের প্রধান উৎস। প্রায় ১০ কোটি লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা দরিদ্র সীমার নীচে। প্রায় ২৫% লোক ভূমিহীন। পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত দেশের প্রায় ৯০% ভূমি সমতল। ছোট-বড় প্রায় সাত শতাধিক নদ-নদী এদেশের ভূমিকে বিপুল উর্বরা শক্তি দান করেছে। ১৯৯২ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মোট আবাদ- যোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩,৪৭,৮৬,০০০ একর। এর মধ্যে সেচের আওতাভূক্ত ভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ২০.৮% তথা ৭২,৩৫,৪৮৮ একর এবং সেচের আওতা বহিভূর্ত ভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ৭৯.২% তথা ২,৭৫,৫০,৫১২ একর। উক্ত ভূমির মধ্যে এক ফসলী ভূমির পরিমাণ ৮১,৪০,০০০ একর,দুই ফসলী ভূমির পরিমাণ ৯৬,৩৪,০০০ একর , তিন ফসলী ভূমির পরিমাণ ২৪,২৪,০০০ একর, মোট ২,০১,৯৮,০০০ একর। অবশিষ্ট ১,৪৫,৮৮,০০০ একর ভূমিতে ফল- মূল ও অন্যান্য ফসলের চাষ হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু ভূমি পরিত্যক্তও রয়েছে।[৫৩] ১৯৯৬-৯৭অর্থ বছরে কৃষিভূমিতে মোট উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ছিল ২০.৩ মিলিয়ন টন, যার $\frac{1}{3}$ অংশ উৎপাদিত হয় বৃষ্টির পানিতে। অবশিষ্ট $\frac{2}{3}$ অংশের ফসল উৎপাদিত হয় নদীর পানি সেচের মাধ্যমে অথবা গভীর নলকুপের পানি সেচের মাধ্যমে।[৫৪] উপরোক্ত হিসাবের উপর ভিত্তি করে 'উশর ও অর্ধ 'উশর ধার্য করা হলে তার হিসাব হবে নিম্নরূপ: $\frac{1}{3}$ অংশ ফসলের কোন 'উশর হবেনা , কারণ তার উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ হয়ত ৫ ওসক তথা ২৬ মনের নীচে নতুবা তারা অমুসলিম। পরবর্তী $\frac{1}{3}$ অংশের উপর 'উশর তথা $\frac{1}{10}$ অংশ, অবশিষ্ট $\frac{1}{3}$ অংশের উপর অর্ধ 'উশর তথা $\frac{1}{20}$ অংশ আরোপ করা হবে । সুতরাং মোট উৎপাদিত ফসল তথা ২০.৩ মিলিয়ন টনের $\frac{1}{3}$ অংশের পরিমাণ হল ৬.৭১ মিলিয়ন টন যার 'উশর হল ৬ লক্ষ ৭১ হাজার টন, পরবর্তী $\frac{1}{3}$ অংশ এর অর্ধ 'উশর হল ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টন,সর্বসাকুল্যে এর পরিমাণ হল ১০.০৭

লক্ষ টন। যার বাজার মূল্য প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা । 'উশরের এই পরিমাণ কেবল উৎপাদিত ধান এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য কৃষি পণ্যে এর হিসাব ধরা হলে তা ১৫শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

উপসংহার :

'উশর ইসলামী অর্থব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের সাথে এর সম্পর্ক । বাংলাদেশের ভূমি 'উশরী ভূমি। শরীয়াত নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হলে এতে 'উশর আদায় করা ভূমির মালিক কিংবা কৃষকের উপর ফরয। এটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এর প্রকৃত হকদারের নিকট কিংবা বায়তুল মালে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে সরকারী উদ্যোগেই তা আদায় করার বিধান দিয়েছে ইসলাম। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'উশর বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশে বর্তমানে দারিদ্রাবস্থার লোক সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি এবং পূর্ণ দারিদ্রাবস্থার লোক সংখ্যা প্রায় ২.৫০ কোটি। ৮০% লোকের মাথা পিছু আয় ৩৮০ ডলার। বেকার ,প্রান্তিক ক্ষেত-মজুর এবং শ্রমজীবিরা বার্ষিক গড়ে ১৮০ দিনের বেশী কাজ পায় না । এমতাবস্থায় শরীয়াতের নির্দেশিকা অনুসারে 'উশর আদায় এবং পরিকল্পিতভাবে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা হলে এবং এই সব জনগোষ্ঠীকে ত্রাণ, পুনর্বাসন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ঋণ বাস্তবায়ন প্রকল্প ও শিল্প -কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে 'উশর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সূত্র নির্দেশ :

১। ইবরাহীম মাদকূর ও অন্যান্য, আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, কায়রো : ১৯৭২, পৃ. ৬০২।
২। প্রাগুক্ত, পৃ.৬০২।
৩। আল্-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১০।
৪। আল্-কুরআন, সূরা আল্ ওয়াকিয়াহ, আয়াত ৬৩-৬৭।
৫। আল্-কুরআন, সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৩৩-৩৫।
৬। আল্-কুরআন, সূরা আবাসা, আয়াত ২৪-৩২।
৭। আবদুর রহমান আল্-জাযিরী, কিতাব আল-ফিকহ আলা আল্ মাযাহিব আল আরবা'আহ, বৈরুত: দারু ইহ্ইয়া আল্-তুরাছ আল-আরবী,তা.বি.১ম খন্ড,পৃ.১৬; আল্লামা ইউসুফ আল্-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান (বাংলা সংস্করণ), ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী,২০০৩, ১ম খন্ড, পৃ.৩১৫-৩১৬।
৮। সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, ১ম খন্ড, পৃ.২৪১।
৯। আবদুর রাযেক রহীম সিলাল আল-মুহী, বাদাত ফী আল্ আদইয়ান আল্-সামাভিয়্যাহ-আল-ইয়াহুদীয়্যাহ-আল্ মাসিহীয়্যাহ আল্ ইসলাম আল্ আওয়ায়েল, দামেশ্ক: ২০০১, পৃ.১৭৬।
১০। আল-কুরআন, সূরা আল্-আনআম, আয়াত ১৩৬।
১১। আবদুর রহমান আল্ জাযিরী, কিতাব আল্-ফিকহ আলা আল্ মাযাহিব আল্ আরবা'আহ, ১ম খন্ড,পৃ.৬১৬।
১২। আল-কুরআন, সূরা আল্-বাকারাহ, আয়াত ২৬৭।

১৩। ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আল্-তাবারী, জামি'আল্-বয়ান আন তাফসীরি আয়িল কুরআন, বৈরুত :দার আল্-ফিকর,১৯৮৮,৩য় খন্ড,পৃ.৮০।
১৪। আল্-কুরআন, সূরা আল-আন্আম, আয়াত ১৪১।
১৫। ইমাম ইবন্ জারীর আল-তাবারী,জামি'আল্ বায়ান, ৮ম খন্ড,পৃ.৫৩ ।
১৬। প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ.৫৩।
১৭। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল- বুখারী, সহীহ আল-বুখারী ,দিল্লী:কুতুবখানা রশীদীয়্যাহ, ১৩৭৫ হি.১ম খন্ড, পৃ .২০১।
১৮। ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আল্-সহীহ লি-মুসলিম, কলিকাতা: দার আল্ ইশাআত আল্-ইসলামিয়্যাহ, ১ম খন্ড, পৃ.২১৬।
১৯। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন আদম, কিতাব আল্-খারাজ , বৈরুত:দার আল্-মা'রিফাহ , ১৯৭৯, পৃ . ১১৬।
২০। ইবন কুদামা আল্- মাকদাসী, আবদুল- াহ ইবন্ আহমদ, আল্-মুগনী আলা মুখতাছার আল্-কারখী, বৈরুত: দার আল্-কুতুব আল্-ইলমিয়্যাহ,১৯৯৪, ২য় খন্ড,পৃ.৪৩৩।
২১। সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, পৃ-২৪২।
২২। আবূ জাফর আহমদ আল্-দাউদী, কিতাব আল্- আমওয়াল, ইসলামাবাদ : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট,১৯৯৫, পৃ.৫০।
২৩। ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, বৈরুত:দার আল্-মারিফাহ, ১৯৭৯, পৃ.৬৯।
২৪। প্রাগুক্ত,পৃ.৬৯।
২৫। আলা উদ্দীন আবূ বকর আল্- কাসানী, বাদায়ি' আল্- সানায়ি' ফী তারতীব আল্- শারায়ি', দেওবন্দ: দার আল্ কিতাব, তা.বি., ২য় খন্ড,পৃ.১৭৬-১৭৭।
২৬। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, বেহেস্ড়ী যেওয়ার মুকম্মাল-মুদাল- াল, দেওবন্দ; মাকতাবা থানভী, তা.বি. ৩য় খন্ড, পৃ . ৩০।
২৭। মুহাম্মদ হিফযুর রহমান, ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম, চট্টগ্রাম -১৯৮৫,পৃ. ১১৬।
২৮। ইমাম ইবন মাজাহ, সুনান ইবন মাজাহ, দেওবন্দ: ইসলামিক একাডেমী, তা.বি.পৃ.১৩১।
২৯। ইমাম মালিক ইবন আনাস, আল্ মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক,দেওবন্দ : ইয়াসির নদীম এন্ড কোং, তা.বি.পৃ.১১৮।
৩০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
৩১। আল্লামা ইউসুফ আল্- কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খন্ড,পৃ.৩২২।
৩২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
৩৩। ইবনু কুদামা আল্- মাকদাসী, আল্-মুগনী, ২য় খন্ড, পৃ.৪৩৪।
৩৪। আল- ামা ইউসুফ আল্- কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খন্ড, পৃ.৩২৪-৩২৫।
৩৫। ইবনু কুদামা আল্- মাকদাসী, আল-মুগনী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৩৬।
৩৬। ইমাম মুসলিম, আল্-সহীহ লি-মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ.৩১৫, ইমাম বুখারী, সহীহ আল্-বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২০১।
৩৭। ইমাম মুসলিম, আল্-সহীহ লি- মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১৬।
৩৮। ইবনু কুদামা আল্-মাকদাসী, আল্- মুগনী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৩৬; আলা উদ্দীন আল্- কাসানী , বাদায়ি'আল্-সানায়ি',২য় খন্ড,পৃ.১৮০।
৩৯। মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল্- শায়বানী, কিতাব আল্- হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনাহ, হায়দারাবাদ: দায়িরাহ আল্-মা'আরিফ আল্-ইসলামিয়্যাহ ,১৩৮৫হি,পৃ.৪৯৭।

৪০। ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খন্ড,পৃ.২০২।
৪১। আলা উদ্দীন আল্-কাসানী, বাদায়ি'আল্-সানায়ি, ২য় খন্ড, পৃ.১৬৯ - ১৭০।
৪২। ইবনু কুদামা আল্-মাকদাসী, আল্-মুগনী, ২য় খন্ড,পৃ. ৪৩৯ ; ইমাম মুসলিম, আল্ সহীহ লি-মুসলিম, ১ম খন্ড,পৃ.৩১৫, ইমাম নবভীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৪৩। মুহাম্মদ হিফযুর রহমান, ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম, চট্টগ্রাম - ১৯৮৫, পৃ.১১৬।
৪৪। মহিউদ্দীন খান, রোযা, যাকাত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা : মদীনা পাকলিকেশন্স, ২০০১, পৃ. ৬১।
৪৫। আল- ামা ইউসুফ আল্-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খন্ড,পৃ.৩৪১।
৪৬। আলা উদ্দীন আল্ কাসানী, বাদায়ি'আল্-সানায়ি', ২য় খন্ড,পৃ . ১৮১-১৮২।
৪৭। আবদুর রহমান আল্-জাযিরী, কিতাব আল্-ফিকহ আলা আল্- মাযাহিব আল্-আরবা'আহ, ১ম খন্ড, পৃ . ৬১৭।
৪৮। আবূ জাফর আহমদ আল্- দাউদী, কিতাব আল্- আমওয়াল, পৃ . ৫০।
৪৯। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন আদম, কিতাব আল্- খারাজ,পৃ. ২৪।
৫০। আল্লামা ইউসুফ আল্-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খন্ড, পৃ.৩৬৯।
৫১। মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা (বাংলা সংস্করণ), ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ.১৯৯।
৫২। মহি উদ্দীন খান, রোযা যাকাত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৬২।
৫৩। BBS, Bangladesh Statistical year Book, 1992, P,148.
৫৪। Ibid, P, 114, 168.